প্রবাসীর আত্মকথা

সুখ-দুঃখের জীবনকথার সংকলন

জাহাঙ্গীর খান



প্রবাসীর আত্মকথা
সুখ-দুঃখের জীবনকথার সংকলন

প্রবাসীর আত্মকথা
সুখ-দুঃখের জীবনকথার সংকলন

জাহাঙ্গীর খান

শ্রীহট্ট প্রকাশ

প্রবাসীর আত্মকথা
সুখ-দুঃখের জীবনকথার সংকলন
জাহাঙ্গীর খান

প্রকাশক
জিবলু রহমান
শ্রীহট্ট প্রকাশ
মেঘনা-বি/১৮, দাড়িয়াপাড়া, সিলেট।
টেলিফোন : ০৮২১-৭২৮০৯৭, মুঠোফোন : ০১৭১১-১৫৪৬৮২

গ্রন্থস্বত্ব
আফিয়া খান

প্রকাশকাল : মার্চ ২০২২

প্রচ্ছদ
শাশ্বত দাসগুপ্ত

বর্ণবিন্যাস
হাসান মিসবাহ

মুদ্রণে
ওয়ান প্রিন্টিং প্রেস
কুদরত উল্লাহ মসজিদ কমপ্লেক্স (নিচতলা), বন্দরবাজার, সিলেট।
মুঠোফোন : ০১৮১৯-৫৬০০৩০, ০১৭৪২-৩০৩৭৭১

মূল্য : ১৪০ টাকা

Asha-Durasha by: Kanchan Chandra Dash
Published By Jiblu Rahman
Sreehotto Prokash, Meghna-B/18, Dariapara, Sylhet.
Price: BDT **৳140**
ISBN : 978-984-93027-6-6

উৎসর্গ

আমার মরহুম বাবা নুরুল ইসলাম খান ও
মরহুমা মা ফুলজান খানম-এর
চরণে দিলাম আমার জীবনকথার অঞ্জলি

সূচি

প্রবাসীর আর্তনাদ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
মায়ের হিয়া
নিরুদ্দেশ
ছোট্ট মনা নাহিয়ান
মোর মাথিউরা
ছোট্ট খুকি নাদিয়া
স্মৃতির শৈশব
নিশান্ত
প্রেম পিয়াসী
বসন্তের প্রণয়লীলা
শরতের মোহ মায়া
পরিবেশ
মজদুর
তুমি মোর জন্মভূমি
সমুদ্র সৈকত
বেননেভিস
রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা
জাগো সিলেট
তুষার ঝড়
তৃণ তৃষ্ণা
এক নজরে লন্ডন শহর
ব্রেক্সিট কিংডম
গণতন্ত্রের জয়
নগ্ন ভূমি
রঙ্গের খেলা
পঞ্চ বাসি
রাক্ষসী নাইনটিন
রাজমহলের নথি
ঝড়-বাদল

ভূমিকা

দেশ ছেড়েছি অনেক দিন আগেই, তবু দেশের কথা আজো ভুলতে পারিনি। কোনদিন ভুলতে চাইওনি। আজ এত বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে এটা বুঝেছি, দেশ না ছাড়লে দেশের কি মায়া তা বোঝা যায় না। চোখের আড়াল না হলে যেমন, কোন কিছুর মূল্য বোঝা যায় না, ঠিক তেমনি দেশ ছেড়ে, দেশ কত সুন্দর তা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করতে পারছি। এ কথা কেবল আমার কথা নয়, আমার মত সারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রবাসীর কথা। প্রবাসে হয়ত আমি উচ্চশিক্ষা, ধনসম্পদ, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা সবই পেয়েছি, কিন্তু হারিয়ে গেছে আমার সেই গ্রামবাংলার ছায়ামাখা মধুর ছেলেবেলা। ব্যস্ত জীবনের মাঝে চোখ বুজলেই আজও দেখতে পাই আমার নিজের গ্রামের ভিটেবাড়ির প্রতিটি আনাচকানাচ, নালা-নদী, মাঠ-ঘাট, স্কুলবাড়ি, যা আমার 'স্মৃতির শৈশব'। আজো কানে বাজে রাখালের বাঁশির মেঠো সুর, আজো গন্ধ পাই শিশির ভেজা বুনোফুলের, পাকা ফলের।

এসব স্মৃতি আমায় আজকাল ঘিরে ধরে, মন উদাস হয় দেশের পানে। প্রবাস জীবনে অনেক কিছু পাওয়ার মাঝে মন কাঁদে আমার 'বাংলা মা'র জন্য। মনে পড়ে বারে বারে মুক্তিযুদ্ধের কথা। পরিবার, পরিজন, কত চেনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণের মূল্যে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা, ভাবলে চোখে জল আসে। দেশের কোন সঙ্কটে যেমন দূর প্রবাসে কান্নায় বুক ফেটে যায়, তেমনি গর্বে বুক ভরে ওঠে দেশের-দশের যে কোন সাফল্যে। আত্মীয় পরিজনের দুঃখে, বিপদে, বিয়োগে সর্বদা দূর থেকেও সাধ্যমত পাশে থাকার চেষ্টা করেছি, বিনিময়ে কি পেয়েছি তার হিসাব-নিকেশ করিনি কোনও দিন। সর্বদা দোয়া করেছি সবাই ভালো থাকুক।

জীবনের অনেকটা পথ পার হয়ে আজ মনে হয় অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চয় তো কম হলো না। সারাটি জীবন কেবলই দেখে গেলাম, শুনে গেলাম, সয়ে গেলাম কিন্তু কিছু তো বলা হলো না। বিস্তৃত জীবন পরিক্রমার এই প্রান্তে এসে মনে হয় আমারও তো কিছু বলার আছে। কিন্তু কে শোনে কার

কথা, তাই ভাবলাম যদি একটু লিখে যেতে পারি। সংশয় ছিল মনে আমি তো কবি কিম্বা লেখক নই। কিন্তু সে সংশয় দূরে সরে গেল কিছু বন্ধুবান্ধব, সুহৃদ ও পরিজনদের অনুপ্রেরণায়। এলোমেলো মনের কথাগুলো কাগজে কলমে ফুটে উঠল আমার সুখ-দুঃখের জীবনকথা হয়ে। এগিয়ে এলেন প্রকাশক বন্ধু জিবলু রহমান। তার আগ্রহে এই বইয়ের প্রকাশ, তার প্রতি রইল আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম শিল্পী ও সুরকার বন্ধু সৌম্যেন অধিকারীর কাছে। আমার এ বই বিপণনের জন্য নয়, এ বই ভাবীকালের কাছে এক প্রবাসীর মনের অভিব্যক্তির প্রকাশ মাত্র, আর কিছুই নয়। এ বইয়ের একটি পাতাও যদি কারো পড়ে ভালো লাগে, সেটাই হবে আমার এ জীবনে পরম পাওয়া।

জাহাঙ্গীর খান
১ মার্চ ২০২২, লন্ডন

প্রবাসীর আর্তনাদ

স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে হয়েছে অধিবাসী,
অর্থের তাগিদে এরা উদাত্ত এক অভিবাসী।
ঐ বিদেশে এদের ডাকে বিদেশি,
নিজ জন্মভূমিতে বলে এরা নাকি প্রবাসী।

স্বপ্ন দেখেছিল সংসারের দারিদ্র বিমোচনে,
নিজ দেশ ফেলে চোখে জল ঝরে নির্জনে।
প্রবাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমের রক্ত ঝরা ঘামে,
বিজয় মুকুট এনেছে দেশের অর্থনীতিতে।

বিদেশে দিয়েছে যৌবন, শক্তি ও প্রাণ,
জাতি ও সংসার করেছে অফুরান ধনবান।
এরাই জাতির মুকুট বিহীন অমূল্য রতন,
তাদের কষ্টে অশ্রু ঝরা দু'নয়ন।

প্রবাসী হয়ে নিজকে করেছে মহীয়ান
দেশ ও জাতিকে করেছে অর্থের মুক্তিদান।
বিদেশের মাটিতে জীবন করে বিসর্জন,
নিজ সুখ ভুলে- করেছে সম্পদ অর্জন।

প্রবাসীর দেহ হয়ে আছে এক মরু-প্রান্তর,
শুকনো হয়ে আছে সব শিশির সজল।
দেশ হারা দুঃখে ভরা তাদের অন্তর,
অর্থের উল্লাসে জাতির চোখে ঝলমল।

আধুনিক যুগে প্রিয়জন খবর নেয় ফোনে,
মুখে কৃত্রিম হাসি দুঃখে ভরা বিরল মনে।
প্রবাস জীবনে শূন্যতা প্রতিদিনই আসে,
অতীতের নিবিড় স্মৃতি শুধু চোখে ভাসে।

সদা মন চায় ছুটে যেতে মাতৃভূমিতে,
বিরহের ব্যথা লাগে মনে তার স্মৃতিতে।
স্বজনের বিমোচন আচরণের প্রেক্ষিতে
সর্বদাই উন্মুক্ত নিজের জন্মভূমিতে।

প্রবাসে আছে কত সুখ-জানে শুধু তারা,
বাহিরে সুখের লেপন-অন্তরে কষ্টে ভরা।
স্বজনের অন্তিম কালে-হয়না শেষ দেখা,
সমাধি দিতে পারেনি-এটাই তার ভাগ্যে লেখা।

যুগান্তর ধরেই জীবন কাটাচ্ছে পরবাসে,
এখনো আপন করে নিতে পারছে না প্রবাসে।
ভিনদেশী ভাবে-সদা তুমি এক পরদেশী,
আড় চোখে দেখে-এখনো মোদের পড়শী।

স্বদেশের কল্যাণে প্রবাসে অগণিত সংগঠন,
লিপ্ত সবাই ব্যস্ত দয়াশীল সমাজ গঠন।
প্রবাসীর প্রতিরক্ষা নিতান্তই প্রয়োজন,
প্রণোদনের অভাব আছে ঐক্যবদ্ধ প্রবাসী
সমাজ গড়ার সংযোজন।

ধনী হতে যারা ভালো বেসেছিল বিশ্ব পথ,
সদাই হারিয়েছে তারা আপন জগৎ।
সোনার হরিণ ধরতে পারল না তারা,
সবাই আজ মাতৃ-স্নেহ গৃহহারা।

প্রবাসীর গৌরবে উঠছে দেশের পতাকা বিশ্বব্যাপী,
দেশের গান গাইছে তাদের রক্ত ঝরা দেহরূপী।
জাতির কল্যাণে জলপ্রবাহের মত করছে ছলছল,
বিদেশের বক্ষে জাতিকে করছে তারাই উজ্জ্বল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
আজ বিশ্ব ভাষার মুক্তির কান্ডারী।
রক্তঝরা বাংলার রাজপথ,
হয়েছে বিশ্ব ভাষার মুক্তির শপথ।

মাতৃভূমি একটি প্রস্ফুটিত ফুল,
তার বিকশিত সুবাষ মাতৃভাষায় মূল।
মাতৃভাষা মানুষের বিনি সুতার মালা,
হৃদয়ের ভালোবাসার রূপায়িত শালা।

মাতৃভাষা মায়ের মতন,
যতন করে রাখো এ আত্মার বন্ধন।
কখনো বা দিওনা করিতে তাঁর পতন,
ভাষা জাতির মনি-মুক্তা রতন।

রক্ত দিয়ে রেখেছে যারা ভাষার অধিকার,
তারাই জাতির বীরপুরুষ দেশের অহংকার।
তাদের ক্রান্তিলগ্নে জীবন করে বিসর্জন,
পৃথিবীর বহু ভাষা পেয়েছে সম্মান অর্জন।

বাংলা ভাষার জন্য যারা দিয়েছে প্রাণ,
শহীদ হয়েছে তাঁরা স্মৃতির চির অম্লান।
শহীদ মিনার গড়ে উঠেছে তাদের স্মরণে,
প্রভাত ফেরীতে পুষ্পে পুষ্পে ভরে উঠে
শহীদ স্মৃতিচারণে।

মায়ের ভাষা দেশের ভাষা বাংলা ভাষার বদলে,
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা জিন্নাহ সাহেব বলে।
শাসকগোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে সাথে সাথে,

প্রতিবাদ মিছিলে ছাত্র-জনতা ঢাকার রাজপথে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,
সবার প্রাণে বাজে একই সুরে সানাই।
রক্ষা করতে বাংলা মায়ের মুখের বুলি,
খেলো কত পাক-পুলিশের বুলেট গুলি।

আটই ফাল্গুন তেরশ আটান্ন বাংলা সনে,
পাক-পুলিশ গুলি ছোড়ে ভাষা আন্দোলনে।
রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম আরো বহুজন,
উৎসর্গ করিল প্রাণ, রাখিতে বাংলা মান।

আটই ফাগুন স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত অণু,
একুশে ফেব্রুয়ারি নিখিল বিশ্ব ভাষার পরমাণু।
ইউনেস্কো স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস,
বিশ্ব ভাষার অনুপ্রেরণার স্বপ্নবিলাস।
একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্না সাল,
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি চিরকাল।

মায়ের হিয়া

আমার মায়ের কোমল হিয়া মোর হৃদয় স্পর্শ করে
পর্বতসম মায়ের আদরে জীবন স্বর্গ সুখে ভরে
দুঃখ প্রকাশ করে না কখনও যতই কষ্ট পায়
সর্বসময় সে খোলামেলা যেন নিখিল পর্বতছায়।
মমতাময়ী ‘মা’ যে আমার কষ্ট পেয়েছে কতো
সারাটি জীবন বুঝতে দেয়নি তার তিলেক পরিমাণ যত
ভালোবাসার ভান্ডার ছিল তারই হিয়ার মাঝে
নাইকো কমতি এক বিন্দুও সারাটি দিনের মাঝে।
সারাটি জীবন মায়ের আদর বহিছে নিরবধি
আদর করে ‘মা’ যে আমায় দুমোটি ভাত দিত মুখে তুলি।
সৃষ্টিকর্তার কাছে যেমন- আত্মপর নাই,
আমার মায়ের কোমল হিয়াও- অনুরূপ তা’ই।
রাহ পোহালে ‘মা’ যে আমার ব্যস্ত অন্ন জোগানোর তরে
বিনিদ্র রাত অপেক্ষায় সে কখন আমি ফিরবো ঘরে
জন্মাবধি মায়ের সাথে কাটছিল মোর এই জীবন
আমি ছাড়া রহিত না ‘মা’ যেমন জগত ছাড়া কিরণ।
ঘুরে ফিরে মায়ের কাছে থাকতাম যখন বসে
তাঁরই কোলে মাথা রেখে হাত বুলিয়ে দিত সে।
মা হারানোর আকুল শোক সদাই মনে জাগে
হৃদয় কাঁপে তারই স্মৃতি মম হিয়ার মাঝে
করজোড়ে করি প্রার্থনা এই নিখিল পিতার কাছে
‘মা’ যে আমার স্বর্গপরী যেন বাস করে স্বর্গ মাঝে।

নিরুদ্দেশ

এ বিশ্ব ললাটে, এসেছিলে তুমি ভুবন দেখাতে মোরে
তোমায় যে আমি রাখতে পারিনি মোর এই করুণ জীবনে ধরে।
চিরতরে তুমি চলে গেছো নিরুদ্দেশে এ ভুবনে একা ফেলে মোরে।

সারাটি জীবন কাটিয়ে দিলাম এ জীবন যুদ্ধে
একটি সুবর্ণ জীবনের উদ্দেশে তোমারই আশীর্বাদে
কতকিছু মোর এসেছিল এই ভালে ছিল করিতে শেষ
পারিনি করিতে সে সব কাজের ভ্রমহীন অবশেষ।

জীবন হলো এমন নাই তার অন্তিম
এতকিছু করেও মোরা পাই নাই অসীম
তবুও মোরা পারিনি ছাড়তে তার পিছু অন্বেষণ
মোদের জীবনে আসে যখন শেষ নিশ্বাসের ক্ষণ।

কেনই বা এসেছিলাম, এই ধরণীতে স্বল্প সময়ের নির্বাসে
নিমেষে সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে নিয়তির ডাকে শেষে।
তবুও মোরা সব জেনেশুনে করি শুধু লোভ লালসা,
বিসর্জন করিতে পারিনি মোরা জীবনের যত আশা।

পর্বত সম প্রজ্ঞা অর্জন আজ শুধু জীবনের সম্বল
অনেক সময় বিলিয়ে দিয়েছি মোরা অজ্ঞাত অদৃশ্য জীবন চঞ্চল।

যাহা করি মোরা স্মৃতি রেখে যাই
সঠিক কাজ যেন করে পাই ঠাঁই
প্রজন্মের-প্রজন্মরা যেন তারে খুঁজে পায়
এরই মাঝে রইবে তার প্রকৃত পরিচয়॥
কিছু কাজ মোদের করে যেতে হবে সেই অন্তর্যামীর কাছে
পরকালের বিচার দিনে তবেই একটু রেহাই আছে॥
পৃথিবী যাপন যে আসল নয় মোদের পরিচয়

সবশেষে সবার গন্তব্য যে কবর স্থানেই হয়
স্বপ্ন মোদের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে
সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে তাই নিরুদ্দেশে যেতে হবে ॥

ছোট্ট মনা নাহিয়ান

আমার আছে এক ছোট্ট মনা
ছোটো ছোটো কথা তার
অবিরত বলে বলে বেড়ায়
সেটা বুঝা বিষম দায় ॥

নিত্য সে যে ব্যস্ত থাকে
এদিক সেদিক ঘুরতে
একটুও তার নেই যে সময়
বসে বিশ্রাম করবে।

কার্টুন দেখতে সে ভালোবাসে
আছে তার পছন্দের কার্টুন
বা বা ব্লাক শীপ আর
উইলছ অন দা বোস
আরও কতকিছু নতুন।

জীবজন্তু সে যে পছন্দ করে
দেখালে নামটি বলে দেয়
অনেক জন্তু চিনতে পেরে
গলায় ডাকটি করে শোনায়।

বয়স এখন তার বছর দেড়
নানান ভঙ্গিতে কথা বলে
মাম মাম আর বাবা, নান নান আর নানা
মিষ্টি গলায় ডাকে সে দাদা আর মামা।

যখন সময় পায় সে তখন
ফেসটাইমে কথা বলে
মুখের নানান ভঙ্গি করে

তার নিজের ভাষা বুঝিয়ে বলে।

বাড়িতে তার আছে র‍্যাবিট
মলি বলে ডাকে তাকে
প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে
তাকে সে খাবার দিতে থাকে।

প্রজন্মের প্রজন্ম নাহিয়ান মোদের
অতি আদরের প্রিয় ভাইয়া
আমার সোনার ছোট্ট মনা
তার 'নানা' ডাকে যায় বুক ভরিয়া।

মোর মাথিউরা

ঐ যে মোর "মাথিউরা" সেথায় মন যেতে চায়,
আঁকা বাঁকা মেঠো পথ গাঁয়ের ভিতরে যায়।
বহুদিন হয়নি হাঁটা মোর গাঁয়ের মেঠো পথে,
স্মৃতি তার বহন করে মম চিত্ত পটে।

দিগন্তজোড়া সোনালী আঁশের চাষে,
নিজকে পাইনা খুজে সবুজ ধানের মাঝে।
সরিষার ফুলে হলুদ রঙে প্রস্ফুটিত শস্যের মাঠে,
চন্দ্রকিরণে বিকশিত হয় মুলা ফুলের ক্ষেতে।

সবুজ বৃক্ষ সারিবদ্ধ আছে রাস্তার দু'পাশে,
তৃণলতায় ঘিরে রয়েছে খালিবাড়ির চারপাশে।
সবুজ ঘাসে ঘেরাও গাঁয়ের চারণভূমি,
কচুরিপানায় ভরপুর হয় বদ্ধ জলভূমি।

দিগন্তজোড়া খোলা মাঠে সবুজের মোহ মায়া,
বটগাছ মেলিয়া দিয়েছে তার ছত্রছায়া।
কৃষাণ-পথিক প্রখর রৌদ্রে পোড়ায়,
আশ্রয় নিয়েছে তাঁরা বটের মাওয়া ছায়ায়।

বৃক্ষ ভরা রাশি রাশি শিমুলের ফুল ফোটায়,
গগণে উড়ায়ে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়।
আমগাছ জামগাছ বাঁশ ঝাড় যেন শিখরচূড়ায়,
মিলেমিশে জড়ায়ে আছে বাড়ির আঙ্গিনায়।

বাঁশের ঝোপে বকের ছানা করেছে বসবাস,
নীড় বাঁধছে চড়ুই পাখি ঘরের কোণঠাসায়।
দীঘি জলে পদ্মফুল পাতার উপর ব্যাঙের বাস,
পুকুর জলে বাড়িওয়ালা করেছে মাছে চাষ।

বাছুর বেঁধে মাসিমা বসেছে গোস্তনে দুধ দোহাতে,
গোয়াল থেকে গরু নিয়ে এল গৃহস্ত গোঠে চরাতে।
রাখাল ছেলে বাজায় বাশি গাছ তলাতে বসে,
দলবেঁধে গাঁয়ের লোকেরা মাছ ধরে খালে-বিলে এসে।

গ্রাম থেকে আজ বহুদূরে করেছি যে বসবাস,
ভাবিছি আমি কোথায় ছিল মোর আদিবাস।
কবে যাব হাঁটতে মোর গাঁয়ের মেঠো পথে,
নিজেকে আবার ফিরে পাব সোনালী দিনের সাথে।

তুমি মোর স্বপ্নে ভরা, নয়ন তারা,
দ্যুলোকে বাজে তোমায় সারা।
তুমি যে স্বপ্ন টুটা কানিগাঙ্গের তীর হারা,
তবুও হৃদয়ে, তোমায় নিয়ে স্বপ্নে ভরা।

ছোটবেলায় তোমার মাঠে করেছি খেলাধুলা,
সারাবেলা কাটিয়ে দিয়ে ফিরছি সন্ধ্যাবেলা।
তোমার বক্ষ পানে বহিছে কত খাল ও নালা,
বাটা বাজার, ঈদগা বাজার ঐতিহ্যের শালা।

তোমার মাটির গন্ধ ছড়ায়ে আছে মোর অঙ্গে,
তুমি চিরকাল জড়িয়ে থাকবে মর অন্তরঙ্গে।
তোমায় নিয়ে সারাক্ষণ করি গর্ব মোরা,
তুমি রুপের রানী মোদের রূপসী
“মাথিউরা।”

ছোট্ট খুকি নাদিয়া

ছোট্ট খুকি নাদিয়া তার নাম
আদর করে তারে নাদান বলে ডাকি,
লেখাপড়া শেষে এখন সে ডাক্তারী করে।
কখন সে হয়েছে বড়ো, একটুও বুঝতে পারিনি
সে যে আমার অতি আদরের, নয়নতারা মণি।

হেসে খেলে দিন কাটাতো ঘরের কোণে
আমি শুধু বসে থাকতাম তারই দিকে চেয়ে।
কাজের শেষে বাড়ি ফিরে এলে বলতো
জড়িয়ে ধরে সে, এলে কেন এত দেরিতে।

আজ আমার সেই ছোট্ট খুকীর বিয়ে,
সানাই বাজে স্বজন ভরা ঘরে।
খুকি যে আজ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি,
সেই আনন্দে মোর নয়নজলে ভরে।

আঁখিজল মুছে খুকি যাও গো শ্বশুরবাড়ি
আপন ভেবে গড়ে নাও নিজ সংসার
দেখবে সব সমস্যার হবে সমাধান
আনন্দে উঠবে ভরে জীবন সবার।

অতিথিরা এসেছে আজ বিয়ের অনুষ্ঠানে,
সবাই মিলিত হয়েছে বোশী কান্ট্রি ক্লাবে
দূরত্ব মেনে বসেছে সবাই যে যার নিজ বাবলে
সরকারি নিয়ম মানতে হচ্ছে কোভিড নাইনটিন প্রভাবে।

রক্তের বাঁধন ছেড়ে চলে যাচ্ছো অন্য সংসারে,
মা-বাবা ভাই-বোন সবাই হতাশ হয়ে কাঁদে
যে তোমার জীবনের সুখ দুঃখের সাথী হবে,
তারই আস্থাভাজন হয়ে থেকো তবেই চিরসুখী হবে।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখি চারিদিকে যেন শূন্য,
হাহাকারে ভরা হৃদয় কেবলি তারই শূন্যতায় পূর্ণ
যেদিকে তাকাই সেদিকেই তাঁরই প্রতিচ্ছবি,
তারই মায়ায় মন উদাস হয়েছে ফাঁকা লাগে আজ সবই।

বেলা শেষে যখন একা নীরবে বসি
দুচোখ আমার জলে ভরে আসে
তখন ভাবি আমার নাদন গেছে চলে,
মোর অবাক নয়নে কেবল তারই মুখটি ভাসে।

স্মৃতির শৈশব

ইচ্ছে জাগে জন্মস্থানে চলে যেতে,
প্রতিদিন সে যে মোর স্বপ্নে আসে।
শৈশবের কথা মনে পড়ে আজ খুবই
সেই স্মৃতি মনে বারে বারে ফিরে আসে।

হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতাম মোরা
আঁকাবাঁকা হালট আর গোপাট দিয়ে।
বানের জলে ভরে যেত বাড়ির আঙ্গিনা
মাঠ, পুকুর, খালবিল নালা থৈ থৈ জলে।
প্লাবন জানি এক সর্বনাশী,
তবুও সে যে মোদের প্রমোদের বাঁশী
শিশুরা তাই আনন্দে মাতিয়া উঠে,
জলে ঝাঁপ দিয়ে কত আনন্দে হয় খুশি।

ডিঙ্গিনৌকা নিয়ে শাপলা-শালুক কুড়াতে,
ধানের ক্ষেতে রাতে মাছ শিকার করে।
ঘুন্টি নৌকা দিয়ে কুটুম বাড়িতে যেতে,
ভাটিয়ালি গান গাইত মাঝি আপন সুরে।

ভরা বর্ষায় সারি গান গেয়ে গেয়ে,
নদীতে নৌকা বাইচে মোহিত সবাই।
বংশীওয়ালা তরীতে বসে দূরে চেয়ে
আপনমনে সে মুরালি বাজায়।

অগ্রায়ণ মাসে তাড়ী দিয়ে,
নতুন ধানের পিঠা খাওয়া।

সন্ধ্যাবেলায় খেলা শেষে মাঠে,
খড়ের আগুনে সবাই আলু পোড়ায়।

শীত মৌসুমে সকালবেলায় উঠানে
বসতাম একটু সোনালি রোদের মাঝে।
স্বজনদের সাথে শহরে যেতাম সবাই
কত আনন্দ ছিল সিনেমা দেখার মাঝে।

ফেরিওয়ালার ডাক, রিকশার টুংটাং শব্দ
গাড়ির হর্ন, আরও কত কিছু মনে পড়ে
যে শৈশব আর আসবে না ফিরে কখনও
স্মরণীয় হয়ে থাকবে স্মৃতির পাতা জুড়ে।

নিশান্ত

ভোরের আকাশ জুড়ে কত লালিমা রাশি
আপন গতিতে চলছে ছড়িয়ে তার যত হাসি
মধুকণ্ঠে পাখিরা গাইছে গুলেনার বনে
ঊষার শিউলি গন্ধ ছড়ায়, আপন উদাস মনে।

মুয়াজ্জিন আজান ফুকাল উচ্চ ধ্বনিতে
তন্দ্রা বিলাস টুটে ছুটেছে মুসল্লীরা মসজিদে।
নিশাবসানে পৌরজন করিল নিদ্রাত্যাগ
নগরে, বন্দরে, লোকালয়ে হইল জমজমাট।

নিশাপতি জেগে ছিল সারারাত
নিশাবসানে নক্ষত্রের আলোয় নিশান্ত
নিশি শেষে অন্তরালে যাচ্ছে শশী
জাগছে রবি শস্য খেতের দিগন্ত।

শিশির ভেজা সবুজ ঘাসের গালিচায়
বিন্দু বিন্দু দুলছে শিশির কণা
প্রভাত আলোয় দিচ্ছে ঝিলিক এমনই
যেন হীরা মতির দুলটি বঁধুর কানে ॥

প্রভাতে পড়শীর কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল
বেণু হাতে রাখাল চলেছে ধেনু চরাতে
নহরে নঙ্গরে তীরে বাঁধা তরী
বৈঠা হাতে মাঝি যাচ্ছে নহর ঘাটে ॥

পাখির কণ্ঠে ভোরের সুরেলা কূজনে
নিশিভোরে জাগিল মোর অন্তর
মোর দেহ মনে তরঙ্গের ছোঁয়া লাগিল
জাগিয়া উঠিল মোর হৃদয়ের পিঞ্জর ॥

প্রেম পিয়াসী

ওগো সই যেওনা ফেলে
একলা মোরে ঐ নন্দন গাঁয়ে
দুজন মিলে থাকমু মোরা
চন্দনেরও কুটিরে।

খোঁপার বেণির ভাঁজে ভাঁজে
পরিয়ে দিব বেলির মালা।
তোমার কেশের সুবাসে তাই
ভরবে আমার হৃদয়শালা।
তোমায় আমি সাজিয়ে দিব সাদা শাড়িতে
নকশী কাঁথার রঙ্গিন ফুলে...
বাগিচায় বসে মোরা-ছড়িয়ে দিব পা দুখানি,
হেসে খেলে কাটিয়ে দিব দিন রজনী ॥

আলতা পরিয়ে দিব তোমার নূপুর পায়ে,
হাঁটবো মোরা আঁকা বাঁকা, মেঠো পথে গাঁয়ে
সখীরা ঘুঙ্গুর পরে, যাবে মোদের সাথে
মধুর রোলে বাজনা বাজবে, মোর হিয়াতে।

নূপুর পরে নাচবে ময়ূর, গায়ের কুঞ্জবনে
নিত্যার নূপুর বাধিয়া লইব মোর দুটি চরণে।
হরিণীর ছন্দে হৃদয়, নাচবে তালে তালে
খোলায় হাওয়ায় দুলবো মোরা, মাখবো আলো গায়ে।

তালে তালে নাচবো মোরা,
মাতিয়ে দিব ভুবনটারে
দ্যুলোকে ভুলোকে বাজবে বাজনা
তোমার মধুর প্রেম পিয়াসে।

তুমি মোর প্রেম পিয়াসী
আমায় না যাইও ছেড়ে।
রাখবো তোমায় যতন করে
আমার মনের পিঞ্জিরে।

বসন্তের প্রণয়লীলা

বসন্ত এসেছে নয়নে লাগিল নেশা,
নীরবে বহিছে প্রেম প্রকৃতির ভালোবাসা।
আকাশের নভোনীলে মন লেগেছে গোপনে,
বাসনার রং মিশে শ্যামল স্বপনে।

বসন্তের ছোঁয়ায় নিকুঞ্জে মুকুলের অবকাশ,
কানুনে ফুটেছে কলি সুবাস ছড়ায়ে চারপাশ।
মরুদ্যান ফিরে পেল যেন তার প্রাণ,
বৃক্ষ পল্লব শাখায় করেছে বিতান।

তরুলতায় লেগেছে মোর প্রণয়লীলা,
যেন সুন্দর এ ভুবনে ঋতুরাজের মেলা।
গাছের পাতার আড়ালে পাখির কলতান,
মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত গুলিস্তান।

জুঁই চামেলি চম্পা ফুটেছে গুলবাগিচায়,
পুষ্প রূপ সৌরভ লুটায় মনের আশায়।
প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়,
রঙ্গিন করেছে দেহ তার পরাগ মাখায়।
ভ্রমর ফিরে আসে বারে বারে ফুল শাখায়,
সুধা পানে মশগুল মাতাল ও নেশায়।

বাগিচা ভরপুর ফুল শাখায়,
দুলছে পুষ্প বান উত্তরের হাওয়ায়।
মহারণ্য পরিপূর্ণ লতায় পাতায়,
উদাসী পুষ্পবন উল্লাসিত সবুজ ছায়ায়।

নন্দন কাননে সবাই কাঁধে ধরাধরি
আনন্দে ঘুরে বেড়ায় যুগল নরনারী।

নর তুলে দেয় ফুল, হাতে নেয় নারী,
নারী তাকিয়ে দেখে, নর হাসে গাল ভরি।

বসন্তের মুকুল ভাঙ্গা ফাগুন চৈত্র মাস,
ফুলে ভরা শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার আভাস।
মুক্ত হাওয়ায় গন্ধ ছড়ায়ে যায় নিশিদিন,
রিক্ত হৃদয় মুগ্ধ করে, মন হয়েছে উদাসীন।

শরতের মোহমায়া

শরতের আগমনে হিম এসেছে ছুটে,
গা'য়ে লেগেছে মোর শীতল হাওয়া।
তারই স্পর্শে শিরশিরিয়ে উঠেছে তনু,
শাল দিয়ে ঢেকেছি মোর অঙ্গ ছায়া।

শরতে ঝরে যাওয়া শুকনো পাতা,
উড়ে চলছে সব হাল্কা হাওয়ায়।
উদ্যানে গাছপালা চির অনাবৃতা,
খোলা আকাশের নিচে শূন্য পাতায়।

কুঞ্জবন হারিয়েছে তার রূপের লাবণ্য,
হয়েছে মরুভূমির মত এক শূন্য শালা।
কুঞ্জবনে পাখিরা সব করে গুঞ্জন,
বৃষ্টিতে ভিজে যায় পায়না পর্ণশালা।

কাঠবিড়ালি লেজ উঁচিয়ে ঘুরছে ডালে,
সারাক্ষণ সে খুঁজে বেড়ায় ভোজনশালা।
সে যে এতই পেটুক, খায় পায় যেথায় যেটুক,
লাফালাফি করে শাখায়, না মেটে ক্ষুধার জ্বালা।

জ্যোৎস্না রাতে শারদ ও সন্ধ্যায়,
শিউলি ছড়িয়ে দিয়েছে তার মৃদু গন্ধ।
তারই মিষ্টি ঘ্রাণে জুড়ালো প্রাণ,
মন নেচে উঠে পায় কত আনন্দ!

নীল আকাশে সাদা মেঘগুলোর,
নেই কোন আবেগের বাধাবিঘ্ন।
মুক্ত গগনে হেসে ভেসে ঘুরে বেড়ায়,
তারই মাঝে আছে শুধু ভালোবাসার ছন্দ।

নদীর ধূসর চরে সাদা কাশফুল,
মৃদু শীতল বাতাসে দোল খায়।
নীর ভরা নদী আজ শূন্য মনে,
নীরব হয়ে আছে শুধু নিদ্রায়।

সোনালি শারদ প্রাতে আবাসের পাশে,
শিউলি ঝরানো শিশির ভেজানো ঘাসে।
হাসির শরতে ফুল কুড়াইয়া তুলে
মোর মাধুরী কোমল কূলে,
দু'হাতে গাঁথি মালা শিউলি ফুলে।

হিমঝুরি ফুটেছে নিশি রাতে,
শরতের হিমময় বাতাসে মধু গন্ধ
ছড়িয়ে দিয়েছে আলোকপাতে।
ভোরের আগেই সে ঝরে পড়ে যাবে,
নতুন যৌবন আবার নিশিতে ফিরে পাবে।

পরিবেশ

পরিবেশ মোদের সার্বজনীন অংশভাগ
দূষণ করে মোরা হয়ে যাচ্ছি অবাক।
সৃষ্টিকর্তা তৈরি করেছে এ নিখিল ভুবন
এ ছাড়া যে চলে না মোদের জীবন।

সমৃদ্ধশালীরা প্রাকৃতিক খনিজসম্পদ পুড়িয়ে,
তৈরি করছে কৃত্রিম বস্তু কল কারখানায়ে।
মোড়লদের প্রভাব খাটাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,
বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে এদের কর্মকাণ্ডে।

পৃথিবীর পরিবেশ নির্ভর করে
প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর।
বিজ্ঞানীরা পরিবেশকে করেছেন দু'ভাগে বিভক্ত,
Abiotic হচ্ছে প্রকৃতি আর
Biotic হচ্ছে মানুষ ও জীবজগৎ।

বাঁচিয়ে রাখতে হবে প্রকৃতিকে,
যেমন- আলো, বাতাস, জল-মাটি,
পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর,
নদ-নদী, হ্রদ, জলাশয়, ঝর্না,
মেরু অঞ্চল, মরুভূমি,
বনভূমি, তৃণভূমি, তৃণলতা,
গুল্ম, বৃক্ষ প্রভৃতি।
তা না হলে বেঁচে থাকতে পারবে না
মানুষ ও জীবজগৎ।

আধুনিক বিশ্ব গড়তে সবাই ব্যস্ত ব্যাকুল,
বনাঞ্চল আবাদ করে তৈরি হচ্ছে শহরাঞ্চল।

বুঝতে পারছে না মানবজাতি,
কীভাবে করছে নিজেদের ক্ষতি।

একটা দেশের আয়তনের তেত্রিশ ভাগ,
অরণ্য থাকা একান্তই প্রয়োজন।
নতুবা মানুষ ও জীবজগতের,
সুস্থ বেঁচে থাকার ভারসাম্য হবে অপূরণ।

কাননে কুঞ্জের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন
প্রাণীরা তা নিয়ে করে শ্বাস-প্রশ্বাস।
মোদের ফেলা দেওয়া-কার্বন ডাই অক্সাইড
আহরণ করে নিয়ে- কুঞ্জবন করে বাস।

অক্সিজেন ছাড়া বাঁচে না যে প্রাণী,
একে অন্যের নির্ভরশীল বলে জ্ঞানীগুণী।
তাই মোরা বেশি করে গাছ লাগাই
মানবজাতিকে সবুজের মাঝে বাঁচাই।

কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রিনহাউস গ্যাস,
বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বজায় রাখে।
কিন্তু মানুষের বর্ধিত গ্রিনহাউস,
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে
এই গ্যাসটিকে অশুভ করেছে।

জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই গ্যাস
এটি বিহীন গাছপালা অক্ষম সালোকসংশ্লেষণে।
এই ভূখণ্ডে তাই নিতে হবে মোদের শ্বাস
ভরসা কেবল জীবনদয়ী গ্যাস অক্সিজেনে।

বর্তমান পৃথিবী ছাতার মত
ঢেকেছে গ্রিন হাউস গ্যাসে,
যা বিশ্বের উষ্ণতা বাড়িয়ে চলেছে

সীমানারেখার উপর অবশেষে
অনাবৃষ্টির কারণে গড়ে উঠছে মেরুপ্রদেশ,
তাই খাদ্য উৎপাদন- সংকটে পড়েছে বহু দেশ।

বরফে ঢাকা পাহাড়ের বরফ গলে
স্তর বাড়ছে ক্রমশ সমুদ্রের জলে।
নদীর তীরবর্তী শহরাঞ্চল ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলির
সামনে সমূহ বিপদ সংকেত এর ফলে।
অনায়াসে বিলীন হয়ে যাবে সমুদ্রের মাঝে।
তাই মোদের চিন্তা করতে হবে,
কেমন করে এই পরিবেশ বাঁচাবে।
মাঝে মধ্যে হয় বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন,
কিন্তু কেউ আমল করে না এরপরে।
কেটে পুড়িয়ে ছাই করছে বনাঞ্চল,
কোন ভালো প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ
করে না কেউ কারও উপরে।

দারিদ্র মানুষের চেতনার পরিপন্থী,
পরিবেশের আগে-লাগিবে ক্ষুধা নিবৃত্তি।
যদি উন্নত দেশগুলি খুলে দিত ধনের ভান্ডার,
নিঃশর্তে সাহায্য করিতে-
দারিদ্র দূরীকরণে হত কান্ডার।
যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে বিশ্বের মাঝে,
ধ্বংস হয়ে যাবে পরিবেশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

মানুষকে এই পৃথিবীতে বাঁচতে হলে
কৃত্রিম পরিবেশেরও প্রয়োজন আছে।
যেমন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি,
উৎপাদন, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি।

রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে ৫ই জুন ১৯৭২ সালে,

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়
প্রথম পরিবেশ বিষয়ে সম্মেলন।
তাই ৫ই জুন হোক বিশ্ব পরিবেশ দিবস,
বিশ্ব মানবজাতি মিলেমিশে করি তার উৎসব।

মজদুর

শ্রদ্ধা করি পৃথিবীর সকল মজদুরকে,
বিত্তশালীরা বিলাসিতা করে এদের জন্যে।
আমরা সবাই অন্তহীন শ্রমিক বলেই,
শ্রম দিচ্ছি- নিজ কাজে আপনমনে।

চাষ করে কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রমে
মোদের খাবার জোগান দেবার তরে
তাইতো মোরা বেঁচে আছি এ ধরণীতে
ধনীর ভাণ্ডার ভরপুর সঞ্চিত শস্যাগারে।

জেলেরা মাছ ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
ভয়াবহ প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝে।
সে মাছ পরিবেশন হয় আনন্দ অনুষ্ঠানে
ভোজনবিলাসে ধনীদের আসর মাঝে।

ময়লা পরিষ্কার হয়, ধাঙ্গড়ের শ্রমে
তাই মোরা পাই দূষণ মুক্ত বাতাস
শ্রমিকের শ্রমে গড়ে ওঠে রাস্তাঘাট,
বড়লোক গাড়ি ঘোড়া চড়ে করে বিলাস।

তাঁতিদের শ্রমে চলে বস্ত্র কারখানা,
সভ্য পোষাকে হয়েছি আমরা সামাজিক
দর্জির পরিশ্রমে সেলাই করা পোষাকে,
খুঁজে বেড়াই নতুন ফ্যাশন ডিজাইনের ম্যাজিক।

রিকশাওয়ালা কি করে দেখেছো কখনও
ক্লান্ত শরীরে সারাদিন প্যাডেল টেনে চলে
শহরে বন্দরে ঘুরে বেড়ায় অন্ন জোগাড়ে
শ্রম বিলিয়ে অন্যকে বয়ে চলে।

আধুনিক সৌখিন অট্টালিকা নির্মাণ
কে বা কারা করে, ভেবে দেখেছো হে কড়িয়াল/
শ্রমিক, মজদুর, মেহনতী মানুষ এরাই
এদেরই শ্রমে গড়া হয় পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মহল।

তৈরি করে মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র যারা
এই পৃথিবীরই শ্রমিক মানুষ তারাও
উড়োজাহাজ সহ উন্নত প্রযুক্তি যত-
তৈরি করছে যারা শ্রমিক এরাও।

শ্রম দিয়ে যারা নিজের জীবন চালায়
তারা যে সবাই আদর্শগত শ্রমিক।
পার্থক্য না করে সবাইকে শ্রদ্ধা করি
সকলের প্রতি রইল হাজার স্যালুট।

সমুদ্র সৈকত

সাগর পানে নয়ন আমার
ঢেউয়ের জল তরঙ্গে।
সবাই মেতে-উঠছে খেলায়
বালুকাময় সৈকতে কত রঙ্গে।

বালি দিয়ে তৈরি করা
ঘর, দুর্গ ও পাহাড়
সাধের গড়া ভাসিয়ে দেয়
সাগরের ভাটা ও জোয়ার।

যতই তাকাই সাগর পানে,
উদাস করে মন খানি।
হাজারো লোকের পদচারণায়
মুখরিত হয় দীর্ঘ-বেলাভূমি।

ঢেউয়ের মাঝে সাঁতার কাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ি লোনা জলে
ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসে যায়
মুখখানি মোর যায় লুকিয়ে।

মাঝি ধরেছে হাল, নীল দরিয়ার জলে
এই সমুদ্র উপকূলে কতজনার, জীবন জীবিকা চলে।

একঝাঁক ধরেছে হাল, নীল দরিয়ার জলে
এই সমুদ্র উপকূলে কতজনার, জীবন জীবিকা চলে।

একঝাঁক গাংচিল চিকচিক ডেকে
উড়ে বেড়ায় আপন মনে
ডানা দুটি মেলে দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে
সমুদ্রে মাছ শিকারের সন্ধানে।

প্রভাত সূর্য উঠছে জেগে
তারই আভা নীল সমুদ্র জলে।
দিবা শেষে আবার রক্তিম আভায়
অন্তিম হয়ে যাচ্ছে সাগর কূলে।

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের কিরণ
ঝিলিক দিচ্ছে নীল সাগর জলে।
লোনা বালুচরে হাঁটে খালি পায়ে
ঝিনুক বেঁধে দেয় প্রিয়জনের আঁচলে।

ঢেউয়ের শড় শড় শব্দের মাঝে
আছে কত ভালোবাসা অফুরন্ত।
সারাদিন সে যে থাকে কত ক্লান্ত
তীরে বসে তাকালে, মন হয় শান্ত।

বেননেভিস

পর্বতগুলো দাঁড়িয়ে আছে
খোলা আকাশের নিচে।
কোথায় উঁচু কোথায় নিচু
এই দৃশ্যের সমতুল্য নেই কিছু।

গাছপালা তৃণলতা,
জড়িয়ে আছে তাঁদের অঙ্গে অঙ্গে।
সবুজ ঘাসের গালিচা মোড়া আছে-
পাথরের উচ্চভূমিতে।

মেঘের কুণ্ডলী ধাক্কা খেয়ে,
জল জমেছে পর্বত শৃঙ্গে।
ঝর ঝরিয়ে ঝরনার জল
গড়িয়ে পড়ছে তাদের বক্ষ পানে।

আমার হৃদয় হরণ করেছে
হাইল্যান্ডের-বেননেভিসের চূড়া।
ভেবে আমি পাইনা খুঁজে,
কি করে ছোঁব ঐ শৈল শিলা।

ধীরে ধীরে উঠি পর্বতারোহণে,
বড়ই কঠিন পথ চলা যে
পা চলে না, দেহে ক্লান্তি নামে
(জানি) শিখরে পৌঁছিলে গ্লানি মুছে যাবে।
তাকিয়ে দেখি দূর পানে চেয়ে
মেঘেরা ঘিরেছে তার ওপর
কোথাও কিছুই যায় না যে দেখা
মেঘের কালো বেশে

বেলা পড়লে কুয়াশায় ঘিরে
ঢেকে যাচ্ছে গিরির চারপাশে
পথ দেখা যে, যায় নাকো আর
ফিরে চলো নিচে সত্বর।

প্রতিদিন কত শৈলারোহী
তার চূড়ায় যাবার স্বপ্ন দেখে
সবার ভাগ্যে তা হয়না মোটেই
তার শেষ শৃঙ্গখানি পৌঁছতে।

রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ
নিদ্রামগ্ন সেই নিঝুম রাতে
নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
বর্বর পাকসেনা মেশিনগান হাতে।

শুরু হলো অবিরাম হত্যালীলা
মুছে ফেলতে চায় বাঙালির অভিভাবক
বুলেটের সামনে রেহাই পেলনা কেউ
বুদ্ধিজীবী সহ যত শ্রমিক, কৃষক।

বাংলার আনাচে কানাচে রক্তের বন্যা
ভেসে বেড়াচ্ছিল শুধু মানুষের লাশ
শিয়াল, কুকুর, শকুন তা টেনে নিয়ে খায়
বাংলা কাঁদে আর্তনাদে দিশাহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

রাজাকার-আলবদর ও আল শামসদের সাহায্যে
মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরবাড়ি করল পুড়িয়ে ছারখার
স্বাধীনতার পক্ষের থাকা যত নিরীহ জনগণ
চরম অত্যাচার ও ত্রাসের হলো শিকার।

উদ্বাস্তু হয়ে গেল দেশের মানুষ
থাকলো পাশের দেশে শরণার্থী হয়ে।
পাকসেনা করল জনগণের সম্পত্তি লুটপাট
খুন ও ধর্ষণে লিপ্ত থাকল সহযোগী দোসর লয়ে।

গাভী ঘাস খায় পূর্ব বাংলায়
আর দুধ খায় পশ্চিম পাকিস্তানে।
পশ্চিমাদের এইরূপ শাসন-শোষণে
সঞ্চিত আক্রোশ জাগে বিদ্রোহী মনে।

নির্যাতন-নিপীড়ন ক্রমে সইতে সইতে
বাঙালি পৌঁছেছিল অসহ্যের সীমায়
মুক্তিবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে
লড়াই করতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে।
৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে
আবার চেতনা পেল বাঙালির মনে
"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

"প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলো
আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি...
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে
শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকো"।

"রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব
এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ"

তারই ভাষণে স্পষ্ট হয়ে উঠে স্বাধীনতার ঘোষণা,
মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার- সর্ব দিক-নির্দেশনা।

নয় মাস রক্ত ঝরা যুদ্ধের পর
ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে
আত্মসমর্পণ করল পাক সেনা
মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় পরাজয়ের ক্ষণে।

১৬ই ডিসেম্বরে হলো চূড়ান্ত বিজয়,
লাল সবুজের পতাকা উড়ল আকাশে
বাঙালির ভাগ্যে এলো জয়ের নিশানা
জয় বাংলা ধ্বনি হয় বিজয়ের উল্লাসে।

রণাঙ্গনে কত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন
আতুর-ল্যাংড়া হয়ে আছেন আরও কতজন

স্বামী, সন্তান, স্বজনহারা হয়েছেন অনেকে
৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা।

যাদের আত্মত্যাগে আজ আমরা স্বাধীন
তাদের মোরা গর্ব করে স্মরণ করি।
২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে
পরাধীনতার আগল ভেঙে মুক্তি পেল বাঙালি।

জাগো সিলেট

জাগো মোর সিলেটবাসী
হতে দেব না তোমার সর্বনাশী
যেথায় বহিছে সুরমা ও কুশিয়ারা
সেথায় মানুষ কখনো হবে না সর্বহারা।

প্রকৃতির লাবণ্যে ভরা, তোমার মাধুর্য
নদী, ঝর্না, পাহাড়, টিলা অপরূপ সাজুজ্য
নীল আকাশের নিচে, দিগন্তজোড়া
সবুজ চা বাগান
রূপের রাণী সিলেটকে করেছে
অপরূপ মায়াবি আভায় অম্লান।

খনি সম্পদে ভরপুর তোমার,
অপরূপ এই লীলাভূমি
গ্যাস-তেল, পাথর ও চুনাপাথরে
আমরা কত অমূল্য সম্পদে ধনী।

সিলেট বিভাগের শিল্প প্রতিষ্ঠান
সার, সিমেন্ট, পেপার মিলস,
বিদ্যুৎ, ব্রিকফিল্ড ও সিরামিক কারখানা
গড়ে উঠেছে নানাদেশীয় আধুনিক ফিল্ড।

সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ আছে, তোমার উপরে
আরবের মাটির মিল আছে জানি, সিলেটের মাটিতে
শাহজালাল, শাহপরাণ সহ, তিনশ ষাট আউলিয়ার মাজার
তোমারি পূণ্যভূমিতে ইতিহাস লেখা হবে হাজার হাজার।

মায়ের কাছে শুনতাম শুধু, নাগরী ভাষা ছিল তোমার
বিলুপ্ত এখন পাইনা খুঁজে, এ হল মোদের সর্ব বিনাশ।

চিন্তা করার কিছু যে নাই, মাতের লগে মিল আছে
একে অন্যে বুঝতাম পারি, আমরা যে হক্কল সিলেটি।
প্রবাসেতে বাস করে তোমার, অনেক লোকজনা,
লন্ডন-আমেরিকা সারা পৃথিবী জুড়ে, তোমার যত সিলেটি সোনা।
রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেয় দেশে, অর্থনীতি করে শক্তিশালী,
আত্মীয়-স্বজন ভাই-পরিজন, হয় যে বিত্তশালী।

বিশ্বে পরিচয় তোমার, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ
নামটি তোমার সিলেট হয়েছে, ঐতিহ্যের নাইকো শেষ।

তোমার ঐতিহ্য রসরঙ্গের কথা, রূপে তুমি যে অসীম
সুরমা নদীর উপর রয়েছে, লৌহ নির্মিত সেতু ক্বীন।
সিলেট শহরের প্রবেশদ্বার, চাঁদনী ঘাটের সিঁড়ি
আলী আমজদের ঘড়ি, আর জিতু মিয়ার বাড়ি।
বঙ্কু বাবুর দাঁড়ি, এসব স্মৃতিচিহ্ন প্রবাদ ছড়া
যতই বলি ফুরাবে না শেষ, স্মৃতির দরজা নাড়া।

বিভক্ত আছো তুমি চারটি জেলায়,
সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে
তবুও মোদের একতা এতই
সিলেট মোদের এক বিন্দু প্রাণ যে।

তুষার ঝড়

ঊষায় উঠে চোখ মেলে দেখি
জানালার ফাঁক দিয়ে
ঘন ঘাসে ঘেরা সবুজ বাগান
তুষারে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে।
গাছের ডালে ঘরের চালে
যেন জ্বলছে হিমানী।

আকাশ পানে চেয়ে দেখি
তুষারকণা ঝরছে বারি ধারায়
এ যেন এক বরফের যুদ্ধ
চলছে সারা গগন জুড়ে।

রাস্তাঘাট আর গাড়ি-বাড়ি
কেবল তুষার ঘিরে আছে।
দেখে মনে হয় যেন সাদা রং
কে মাখিয়ে দিয়ে গেছে।

ঝিলের সমস্ত জল যেন আজ
বরফের কংক্রিট হয়ে গেছে।
তুহিনের কংক্রিটের উপরে
জলজ প্রাণীরা দাঁড়িয়ে আছে।

ঘন তুষার মাটিতে হাঁটছে সবাই
ওভারকোট আর মাথায় টুপি পরে।
কেউ করছে আইস স্কেটিং
কেউ বা মেতেছে নানান খেলার ঘোরে।

বাচ্চারা ছুটছে তুষারের মাঝে
সবাই উৎফুল্ল খেলার আনন্দে।

কেউ বরফের বল বানিয়ে নিয়ে
একে অন্যের উপর ছুঁড়েছে মহানন্দে।
কেউ তৈরি করছে স্নোম্যান,
আর কেউ গড়ছে স্নো মাউন্টেন।

পার্কের দিকে তাকালে মনে হয়
সাদা তুষারে গড়ে উঠেছে বনশ্রী।
তুষায় মোড়ানো গাছের ডালের ফাঁকে,
রজনীতে দেখি ঝাপসা চাঁদের রূপশ্রী।

টেম্পারেচার চলছে মাইনাসে
পুরো দেশটি আজ বরফে ঢাকা
শীতল হাওয়ায় তুষার ঝড়ে
যেন এক সাদা হিমানীর ছবি আঁকা।

তৃণ তৃষ্ণা

আমি এক তৃণ তৃষ্ণা,
আপন মনে বসে আছি কুসুম বনে
কুসুমের সুদর্শনে মুগ্ধ হয়ে
চেয়ে থাকি তারি দৃশ্য প্রাণে।

নিঝুম যামিনীতে-কাননে ফুটেছে কামিনী,
সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছে হেলায়।
তারি ঘ্রাণে ব্যাকুল হয়েছে মোর উদাসী মন,
যেমনি তরুণী নৃত্য মঞ্চে মশগুল নুপুর পায়।

সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
উঁকি দিচ্ছে সব সুগন্ধি ফুল-
গোলাপ, কেয়া, গন্ধরাজ,
বেলি, বকুল ও পলাশ।
আর রজনীগন্ধার সুবাসে
মুখরিত হয়ে উঠেছে চারপাশ।

রজনীগন্ধা রাত্রির এতই সুগন্ধী ফুল,
রজনীতে ফোটে এ ফুল তারই মোহনীয়
সুবাস পরিবেশকে মাতিয়ে তোলে।
যেমনি প্রিয়সী আলগা করে খোঁপার বাঁধন
অনায়াসে বসে পাশে।
এর আদি নিবাস মেক্সিকোতে,
১৬ম শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভূখণ্ডে।

বহু জাতের ফুল রয়েছে এ নিখিল ভুবনে,
মালতিলতা, চালতা, চন্দ্রমল্লিকা, রঙ্গন,
রক্তজবা, টগর, শ্বেতকাঞ্চন, ক্যামেলি ও

ঘন্টাফুলের উজ্জ্বলতায় বাগান করে ভরপুর।

কামিনী, গোলাপ ও গন্ধরাজ এদের
আদি নিকেতন এশিয়া মহাদেশে।
কৃষ্ণচূড়া ময়ূরের মতো পেখম মেলেয়ে
এপ্রিলে ফুটে এ ফুল- নানান রঙ্গের
লাল, গাঢ় লাল, কমলা ও হলুদ,
এর উৎসস্থল আফ্রিকার মাদাগাস্কারে।

বরুন আর কদম ফুল বেশ দৃষ্টিনন্দন
হালকা মিষ্টি গন্ধে মুগ্ধ করে সবাইকে।
ম্যাগনোলিয়া, চেরি ব্লসম, কৃষ্ণচূড়া,
প্রকৃতিতে প্রায় ২০০ প্রজাতির ফুলের গাছ
রয়েছে যা প্রাকৃতিকভাবে বৃদ্ধি পায়
পাহাড়ের বন ও বনজপ্রান্তে।

থাইম, টিউলিড, জেরানিয়াম, নয়নতারা, সন্ধ্যামালতী,
লান্টানা কামারা, কাঠগোলাপ, রুয়েলিয়ার,
কসমস, আলপাইন, সিনারারিয়া,
ও হায়াসিনথ এইসব নানান রঙ্গের ফুলে
বাগিচা করে ঝলমল।

বিশ্বের অনেক ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক প্রথার
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে অনেক উদ্ভিদ রয়েছে
যা শক্তিদায়ক, রোগমুক্তি এবং কখনো কখনো
ঐশ্বরিত জগতের মাধ্যম হিসাবেও দেখা হয়।
পদ্ম, মিসলটো, পেয়টে, তুলসী, মরিয়ম,
পদিনা, ইয়ু ও গাজা এই সব পৌরাণিক কাহিনি
আজও মানুষের কাছে অদ্বিতীয়।

আরুম টাইটান-এটি বিশ্বের সবচেয়ে

প্রাচীনতম ও বড় প্রজাতির ফুল।
পাঁচ বছরে একবার এই গাছে ফুল ফোটে
এই ফুল প্রকৃতির এক বিস্ময়।
সম্প্রতি বন জঙ্গল কমে যাওয়া এসব ফুলের
স্থান হয়েছে বিভিন্ন বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

শাপলা ফুল জলজ উদ্ভিদ
হাওর-বাওর, পুকুর-হ্রদ, বিলে-ঝিলে
সাধারণত ফুল ফুটে।
প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি প্রজাতি আছে
পৃথিবীতে এদের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন
নামে ডাকে।
শাপলা ফুল নানা রঙের হয় যেমন সাদা,
লাল, গোলাপি, নীল, বেগুনী, হলুদ ইত্যাদি।
সাদা শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল
আদি নিবাস দক্ষিণ এশিয়ার ভারত,
মিয়ানমার ও বাংলাদেশ।
নীল শাপলা শ্রীলংকার জাতীয় ফুল
এর আদি নিবাস আফ্রিকা মহাদেশে।

মরিয়ম ফুল জন্মে মরু অঞ্চলে,
মধ্যপ্রাচ্য ও সাহারার বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে।
মরুভূমির ধু ধু হাওয়ায় দোলতে থাকে
মরুর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।
বছরের পর বছর শুকনো গাছ-
মাটি আঁকড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে,
বৃষ্টি হলে সে নতুন রূপ ধারণ করে।
শতাব্দী ধরে গর্ভবতী নারীদের প্রস্রাবের সময়
জলে ভিজিয়ে তার জল খাওয়ানো হয়,
নারীদের লেবার পেইন কমাতে সাহায্য করে।

যীশু মাতা মরিয়মের নাম অনুসারে
নামকরণ হয় মরিয়ম ফুল বা মরিয়ম বুটি।

হাসনাহেনা সন্ধ্যায় ফোটে ও সুগন্ধ ছড়ায়
নিশিতে,
এই ফুলটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রজাতি।
জেসমিনকে বলা হয় লেডি অফ দা নাইট,
প্রাকৃতিক পরিবেশে বেশ মানিয়ে নিয়েছে
তাকে দক্ষিণ এশিয়ায়।

দোলনচাঁপা চার পাপড়ি বিশিষ্ট দীপ্ত সাদা
দেখিতে প্রজাপতির মতো আছে তার ডানা।
সন্ধ্যায় ফুটে এ ফুল হালকা মিষ্টি গন্ধ ও
সুবাস আছে তার মাঝে।
আদি নিবাস নেপাল ও ভারতের
হিমালয় অঞ্চলে-
এটি কিউবার জাতীয় ফুল।
স্পেনীয় উপনিবেশ আমলে নারীরা
এই ফুলের মধ্যে গোপন বার্তা লুকিয়ে
আদান প্রদান করতো।

বৃহত্তম ফুল বাগান ইউরোপের
দক্ষিণ নেদারল্যান্ডের কিউকেনহফ শহরে।
ডাচ শব্দ কিউকেনহফ অর্থ হেঁশেল বাগিচা,
একে বলা হয় টিউলিপের স্বর্গরাজ্য।

পৃথিবীতে চার লক্ষাধিক প্রজাতি ফুল আছে,
তাই এসব ফুল ফুটে প্রকৃতির আপন খেয়ালে।
মানুষ সৌন্দর্যপিয়াসী আর মানুষ তার
রুচিবোধের প্রকাশ পায় সেগুলিকে
মনের মত করে রাখে সাজিয়ে।

এক নজরে লন্ডন শহর

লন্ডন এত ব্যস্ত শহর
দিবারাত্রি কাজ করে
শোয়ার সময় নাই।
আজব কান্ড এই শহর যে
ক্ষণিকের জন্য যায়নি নিদ্রায়।

যত্ন করে রাখছে সব সাজাইয়া গুছাইয়া,
রাস্তাঘাট নদী-নালা, খাল-বিল পুকুর ও ঝিল।
ছোটো বড়ো গাড়ি ঘোড়া চলে রাস্তা দিয়ে
স্টিমার আর লঞ্চ চলে টেমস নদী দিয়া।
ভাসমান কেনাল-ভৌটে ঘর বানাইয়া
খাল-নদীতে বাস করে লোকজনা।

টেমস নদীর উপর দিয়ে রয়েছে ৩৫টি সেতু
টাওয়ার ব্রিজ থেকে হ্যাম্পটন কোর্ট ব্রিজ পর্যন্ত,
তারা সকলেই রাজধানীর এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি।
পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য মধ্যে টাওয়ার ব্রিজ,
ট্যুরিস্টদের রয়েছে বিপুল আকর্ষণ।

ক্রমান্বয়ে টাওয়ার ব্রিজ, লন্ডন ব্রিজ,
ক্যানন স্ট্রিট রেলওয়ে ব্রিজ, সাউথওয়ার্ক ব্রিজ,
মেলেনিয়াম ব্রিজ, ব্ল্যাকফায়ার্স রেলওয়ে ব্রিজ,
ব্ল্যাকফায়ার্স ব্রিজ, ওয়াটারলু ব্রিজ।

হাঙ্গারফোর্ড ব্রিজ, গোল্ডেন জুবলি ব্রিজ,
ওয়েরস্টমিনস্টার ব্রিজ, ল্যাম্বেথ ব্রিজ,
ভক্সহাল ব্রিজ, গ্রোভেনর ব্রিজ, চেলসি ব্রিজ,
অ্যালবার্ট ব্রিজ, ব্যাটারসি ব্রিজ।

ব্যাটারসি রেলওয়ে ব্রিজ, ওয়াল্ডসওয়ার্থ ব্রিজ,
ফুলহাম রেলওয়ে ব্রিজ, পুটনি ব্রিজ,
হামারস্মিথ ব্রিজ, রেলওয়ে ব্রিজ,
চিসউইক ব্রিজ, কিউ রেলওয়ে ব্রিজ।

কিউ ব্রিজ, রিচমন্ড লক ফুটব্রিজ,
টিকেনহ্যাম ব্রিজ, রিচমন্ড রেলওয়ে ব্রিজ,
রিচমন্ড ব্রিজ, টেডিংটন লক ফুটব্রিজ,
কিংস্টন রেলওয়ে ব্রিজ, কিংস্টন ব্রিজ ও
হ্যাম্পটন কোর্ট ব্রিজ।

২০০০ বছরেরও বেশি ইতিহাসসমৃদ্ধ লন্ডন শহর
সে নিজেই এক বিশাল জাদুঘর।
এই শহরে একশোরও বেশি রয়েছে জাদুঘর
এদের মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম,
ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম,
ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম,
সায়েন্স মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অফ লন্ডন
ও ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম
সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।

ট্রাফালগার চত্তরের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি,
ও পোট্রের্ট গ্যালারি সহ আরও রয়েছে
শহরের অলি গলিতে বহু চিত্রশালা।

সাউথ ব্যাংক অবস্থিত জনপ্রিয় পর্যটন
টেমস নদীর উপরে “লন্ডন আই”
২০০০ সালকে বরণ করতে গিয়ে
মেলানিয়াম হুইল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিনোদনের জন্য লন্ডন শহরে রয়েছে

বহু বিশালাকার উদ্যান ও খেলার মাঠ।
এর মধ্যে রয়েছে চারটি রয়েল পার্ক,
হাইড পার্ক নগর উদ্যানে স্পিকার কর্নার,
নিখরচায় বক্তৃতা এবং বিক্ষোভগুলি
হাইড পার্কের মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
১৮৭২ সাল থেকে স্পিকার কর্নার মুক্ত বক্তব্য
ও বিতর্কের একটি বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

কেনসিংটন গার্ডেনস উদ্যানটিতে
বহু লোকের পাদচরণে ব্যস্তবাগীশ।
গ্রিন পার্ক ও সেন্ট জেমস পার্ক
রাজকীয় উদ্যান দুটি বাকিংহাম প্যালেসের
দু'ধারে সৃষ্টি করেছে এক দীর্ঘ সবুজ বেস্টনী।

রিচমন্ড পার্ক একটি বিশাল রাজকীয় উদ্যান
এক সময়ে হরিণ শিকারের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ।
এই পার্কে ৬৩০টার বেশি হরিণ আছে এছাড়াও
এই ওয়াইল্ড পার্কে ওয়াইর্ল্ড লাইফে ভরা
যেমন হাঁস, সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঠবিড়ালী,
খরগোশ ও নানান জাতের পাখি।
পার্কের মধ্যে ৩০টি পুকুর প্রত্যেকটির ভিন্ন নাম,
অনেকগুলো খালও আছে এবং খালের দুপাশে
ওয়াইর্ল্ড ফুলে সজ্জিত বাগান।

গ্রীনউইচ পার্কের রয়েছে গ্রীনউইচ মীন টাইম,
রিজেন্টস পার্কে অবস্থিত লন্ডন চিড়িয়াখানা।
কিউ গার্ডেন তিনশ একর ক্ষেত্রফলে অবস্থিত
অপরূপ বিদেশি নানাবিধ উদ্ভিদ।
পুরো নাম রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনস, কিউ।

হল্যান্ড পার্কে রয়েছে জাপানি বাগান

ফুকুশিমা গার্ডেন নামে পরিচিত।
ওর্ল্ড গেটের পাশে আলতাব আলী পার্কে
বাংলাদেশের শহীদ মিনার।
ভিক্টোরিয়া পার্ক, ভ্যালেন্টাইন পার্ক,
ওয়ান্সটেড পার্ক এছাড়া রয়েছে
আরও অনেকগুলো পার্ক।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও লন্ডনের গুরুত্ব অনেক
লন্ডনের রয়েছে অনেক স্থানীয় ফুটবল ক্লাব
তারই মধ্যে অন্যতম আর্সেনাল, টটেনহাম,
চেলসি, ওয়েস্ট হাম আরোও রয়েছে অনেক।
লন্ডনের শহরতলী ওয়েম্বলির স্টেডিয়ামে
ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফ এ) কাপ
ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিকেটের জন্য রয়েছে অনেক বিশাল মাঠ
তারই মধ্যে লর্ডস আর অভেল অন্যতম।
লর্ডস মাঠ ইংল্যান্ড ক্রিকেট তথা বিশ্ব ক্রিকেটের
সবচেয়ে সম্মানবাহী ঐতিহাসিক মাঠে পরিচিত।
যেখানে ইংল্যান্ডের জাতীয় ক্রিকেট দল
ও বিদেশী দলগুলি টেস্ট ম্যাচ খেলে থাকে।

শহরতলী উইম্বলডনের হিস্টোরিক্যাল
ট্রেডিশনাল ঘাসাচ্ছাদিত কোর্টগুলিতে
টেনিসের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা
অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ সামার টাইমে।
প্রত্যেক প্রতিযোগিতাই গ্র্যান্ড স্ল্যাম
প্রতিযোগিতা নামে পরিচিত।

নিউহাম বরার স্টার্টফুটে অবস্থিত
কুইন এলিজাবেথ অলিম্পিক পার্কে

২০১২ সালে হয়েছিল অলিম্পিক টুর্নামেন্ট
তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠছে স্টার্ট ফুট সিটি।

১৯৭০ দিকে ন্যাশনাল ফ্রন্ট স্কিন হেডের
রেসিজমের প্রভাব ছিল খুবই বেশি।
লন্ডনে বর্ণবাদী হামলার শিকার হয়েছেন অনেক
বাঙালিরা তার মধ্যে অন্যতম বর্ণবাদী হামলায়
নিহত হন ৪ মে ১৯৭৮ সালে আলতাব আলী,
এডলার স্ট্রীট, টাওয়ার হামলেটস,
২৬ জুন ১৯৭৮ সালে মধ্যরাতে কাজ থেকে
ফিরে আসার সময় নিজ বাসার নিচে
বর্ণবাদীদের হামলায় নিহত হন শিবলুর রহমান,
রানডাউন ইস্টেট, বও, টাওয়ার হামলেটস।
সেন্ট মেরি পার্ককে বর্তমানে আলতাব আলীর
স্মরণে পার্কের নামকরণ করা হয়েছে।

লন্ডন শহরটি বহুমুখী চরিত্র এর বিচিত্র,
সকল ধর্মের মানুষগুলো থাকে পাশাপাশি,
নেই কোন হানাহানি মারামারি দাঙ্গা ফ্যাসাদ,
মরার পরে সমাধি হয় নিজ ধর্মীয় গোরস্থানে।
লন্ডন শহরে রয়েছে অনেক ধর্মীয় শালা,
মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও সিনাগগ,
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাস করে
একই ছাদের নিচে।

এর মধ্যে খ্রিস্টানদের অন্যতম চার্চ
সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল,
ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে,
ওয়েস্টমিনিস্টার ক্যাথেড্রাল।

মুসলমানদের অন্যতম মসজিদ

ইস্ট লন্ডন মস্ক,
ব্রিকলেন মস্ক,
রিজেন্ট পার্ক মস্ক।

হিন্দুদের অন্যতম মন্দির
বিএপিএস শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দির,
শ্রী নাতজী সনাতন মন্দির,
শ্রী মুরুগান টেম্পল।

ইহুদিদের অন্যতম সিনাগগ
নিউ ওয়েস্ট এন্ড সিনাগগ,
বেভিস সিনাগগ,
সেন্ট্রাল ইউনাইটেড সিনাগগ।

লন্ডনের খ্যাতনামা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে লন্ডন ইউনিভার্সিটি,
ইম্পেরিয়াল,
ইউ সি এল, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস,
কুইন মেরি এবং কিংস কলেজ উল্লেখযোগ্য।
এছাড়া চারুকলা ও বিভিন্ন ধ্রুপদী শিল্পকলার
উপর অনেকগুলি বিশ্বসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

লন্ডন সিটিতে আছে ১০টি সিক্রেট টানেল,
এবং টেমস নদীর সুড়ঙ্গ পথ ৩৩টি রয়েছে।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রিনউইচ ফুট টানেল,
রদারহাইদ রোড টানেল, ব্ল্যাকওয়াল রোড
টানেল।

যুক্তরাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের
আর্থিক জীবন লন্ডনকে কেন্দ্র করে
আবর্তিত হয়।
লন্ডনে বিশ্বের একশতরও বেশি বহুজাতিক

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর অবস্থিত।
লন্ডন যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র,
এই মহানগরীর অর্থনীতি বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম।
লন্ডন শহরের অর্থনীতি এতই বিশাল
আরেকটি উন্নত দেশ সমগ্র অর্থনীতির সমান।

বিশাল নগরী ৩৩টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত,
এর মধ্যে ৩২টি বারা এবং ১টি সিটি অফ লন্ডন।
সিটি অফ লন্ডন, ওয়েস্টমিনস্টার এবং
ওয়েস্ট এন্ড কয়েকটি নগর-জেলা অন্যতম।
সিটি অফ লন্ডন নগরীর ঐতিহাসিক কেন্দ্র,
একাই একটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করেছে।

ওয়েস্টমিনস্টারে ইংল্যান্ডের জাতীয় সরকারের
কার্যালয় হাউস অফ পার্লামেন্ট, হাউস অফ
লর্ড, টেন ডাউনিং স্ট্রিট প্রধানমন্ত্রী বাসভবন,
বাকিংহাম প্যালেস অফিশিয়াল রাজপ্রাসাদ।
অভিবাসীদের আগমনের সুবাদে লন্ডন বর্তমানে
একটি বহুজাতি, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক বিশ্বনগরীতে পরিণত।
লন্ডনের নব্য একটি চেহারাও আছে
যা বহুজাতিক মিশ্রণের ফলাফল,
নতুন এই লন্ডন আধুনিক ও চলতি।

সেন্ট্রাল লন্ডনে রয়েছে উঁচু উঁচু টাওয়ার
টেমস নদীর দু'পাশে দিয়ে গড়ে উঠেছে
চোখ জুড়ানো অত্যাধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট।
কেন্দ্রীয় লন্ডনের বাইরের অংশগুলি
মূলত অনুচ্চ আবাসিক ভবন নিয়ে গঠিত।

ইউরোপের অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় লন্ডন
ভৌগোলিকভাবে বেশি বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত;

শহরটির কোন আধিপত্য বিস্তারকারী
প্রধান কেন্দ্র নেই।
অন্যান্য পশ্চিমা দেশের শহরের তুলনায়
লন্ডনের জনঘনত্বও বেশি।

পাতাল রেলকে বলা হয় লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড,
১১টি টিউব লাইনের ২৭০টি স্টেশন
প্রতিটি লাইনের স্বতন্ত্র নাম :
ডিস্ট্রিক্ট, সার্কেল, বাকেরলু, সেন্ট্রাল,
জুবলি, নর্দান, ভিক্টোরিয়া, পিক্যাডিলি,
হামারস্মিথ এন্ড সিটি, মেট্রোপলিটন
ও ওয়াটারলু এন্ড সিটি।
১৮৬৩ সালে সর্বপ্রথম মেট্রোপলিটন
আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন লেইন চালু হয়।

গ্রেটার লন্ডনে ৩৩০টি ওভার গ্রাউন্ড
ন্যাশনাল ট্রেন স্টেশন।
অন্যতম মেজর ট্রেন স্টেশন হল ওয়াটারলু,
লিভারপুল স্ট্রীট, প্যাডিংটন, কিংস ক্রস, ইউসটন,
চারিং ক্রস, ভিক্টোরিয়া, লন্ডন ব্রিজ।
সেন্ট প্যানকাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন স্টেশন,
এখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে
ট্রেন যাতায়াত করে।
লন্ডনে পুরাতন ওভার গ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশন
লন্ডন ব্রিজ ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউনাইটেড কিংডম কর্নওয়ালের ইলোগানে
জন্মগ্রহণকারী ইংলিশ ইঞ্জিনিয়ার
রিচার্ড ট্রেভিথিক ১৮০৩ সালে সর্বপ্রথম
বাষ্প ইঞ্জিন ট্রেন আবিষ্কার করেন।

১৯৮৭ সালে চালু হয় স্বয়ংক্রিয় লাইট মেট্রো,
ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে চলে এই অটো ট্রেন।
ডকল্যান্ডস লাইট রেলওয়ে-(ডি এল আর)
৭টি লাইনের ৪৫টি স্টেশন মোট ট্রেনের
সংখ্যা ১৪৯টি।

লন্ডন মহানগরীর আনাচে-কানাচে
যাতায়াতের জন্য রয়েছে অগণিত
২৪ ঘন্টা পাবলিক বাস সার্ভিস।
ওয়েস্ট এন্ড হলো ল্যান্ড অফ থিয়েটার,
লন্ডন শহরটি সিনেমা আর থিয়েটারে ভর্তি।
এর মধ্যে অন্যতম থিয়েটার হল-
শেক্সপিয়ার গ্লোব থিয়েটার, ইয়ং বিক,
লন্ডন অপেরা হাউস, লন্ডন কলোসিয়াম,
রিজেন্ট পার্ক ওপেন এয়ার থিয়েটার,
ন্যাশনাল থিয়েটার।

বেকার স্ট্রিট অবস্থিত সবুজ রঙের গম্বুজ
ওয়ালা বাড়িটা ম্যাডাম টুসোড মিউজিয়াম।
পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীদের মোমের তৈরি
মূর্তি সব রাখা আছে দেখলে বোঝাই যায় না
আসল কি নকল।
মেরি টুসোড ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
এই ওয়াক্স মিউজিয়াম,
তারই স্মরণে নামকরণ করা হয় ম্যাডাম টুসোড।

সোহোতে চায়না টাউন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ভরা
ব্রিকলেনে বাংলা টাউন কারী রেস্টুরেন্টে পুরা।
গ্রীন স্ট্রীটে শাড়ি-গয়নার দোকান পাটের ঢের,
হোয়াইট চ্যাপেলে বাংলাদেশি সবজির মেলা।

টাওয়ার অফ লন্ডন রাজকীয় পালাইস
টেমস নদীর তীরে অবস্থিত।
রাজা উইলিয়াম বিজেতা ১০৭৮ সালে
হোয়াইট টাওয়ারটি নির্মাণ করেন।
বর্তমানে টাওয়ারটি একটি অস্ত্রাগার,
কোষাগার, মেনেজারি, রয়েল মিন্টের বাড়ি
একটি পাবলিক রেকর্ড অফিস এবং
ইংল্যান্ডের ক্রাউন জুয়েলসের বাড়ি হিসাবে
বিভিন্নভাবে কাজ করেছে।
লন্ডন টাওয়ার দেশের অন্যতম
জনপ্রিয় পর্যটন পাবলিক আকর্ষণ।

লন্ডন শহরে অবস্থিত ২৯৮টি হসপিটাল,
অন্যতম ফেমাস সেন্ট থমাস হসপিটাল।
সেন্ট জর্জ হসপিটাল সর্ব বৃহত্তম
শিক্ষামূলক হাসপাতাল।
রয়েল লন্ডন হসপিটালে রয়েছে অনেক
রিসার্চ ইনস্টিটিউটশন।
সেন্ট বার্থলোমিউস হসপিটাল লন্ডনের সবচেয়ে পুরাতন
হাসপাতাল বার্টস নামে পরিচিত,
কার্ডিও এবং ক্যান্সার জন্য স্পেশালিস্ট।

আইল অফ ডগস, লন্ডন ডকল্যান্ডস
লন্ডনের মধ্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য জেলা।
ক্যানারি ওয়ার্ফে রয়েছে উচ্চ-বৃদ্ধি ভবন,
ওয়ান কানাডা স্কয়ার এর অনেকগুলি।
যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান
আর্থিক কেন্দ্র।

সিলভার টাউনে রয়েল ডগসে অবস্থিত

লন্ডন সিটি এয়ারপোর্ট বছরে প্রায়
৪.৫ মিলিয়ন প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে।
লন্ডন শহরে গড়ে উঠছে অনেক অত্যাধুনিক
উঁচু উঁচু টাওয়ার যেমন দি স্যাড,
নেট ওয়েস্ট টাওয়ার, গারকিন টাওয়ার,
বিটি টাওয়ার, ল্যান্ডমার্ক পিন্নাসেল।

M25 লন্ডনের অরবিটাল মোটরওয়ে
গ্রেটার লন্ডনের প্রায় সমস্ত অংশকে
ঘিরে একটি প্রধান রাস্তা ইউরোপের মধ্যে
সবচেয়ে দীর্ঘ রিং রোড তার দৈর্ঘ্য ১৮৮ কি. মি.
আরোও রয়েছে ইনার লন্ডন রিং রোড
নর্থ সার্কুলার দৈর্ঘ্য ৪১.৪ কি. মি.
ও সাউথ সার্কুলার দৈর্ঘ্য ৩৩ কি. মি.
A406 নামে পরিচিত।

আধুনিক শহরে রয়েছে পুরাতনের আবাস
দিবারাত্রি আলোয় পুরো এই শহরটি
কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা লন্ডন সিটি।
গাছপালা তৃণলতায় ভরপুর যেন
প্রকৃতির বরেণ্য গোটা এই মহানগরী।

বেক্সিট কিংডম

কত উত্থান কত পতন
অবশেষে হলো তার অবসান।
রাজ্যের কত নেতা হিমশিম
খেলো সিদ্ধান্তের বাগীশে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রবণতায় ছিল
ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের
প্রেসারের মধ্যে দিয়ে।
নেতাকর্মীরা পলিসি গেইম
খেললো তারই পরিপ্রেক্ষিতে।

ব্রিটেন বহিরাগত আমদানির
উপর নির্ভরশীল সর্বক্ষণ।
দেশের খাদ্যদ্রব্যের ও পণ্য
উৎপাদন খুবই নগণ্য।

জনগণ তার আতঙ্কের
মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল।
ব্রেক্সিট হলে অর্থনীতির
অবস্থান হবে কি তখন।

দোকানপাট সুপার মার্কেটে
চলছে কাড়াকাড়ি
জিনিসপত্রের মূল্যের
হয়নি এমন কোনহ্রাস।

সর্বদাই আলোচনা ব্রেক্সিট নিয়ে
ছিল রেডিও-টেলিভিশন ও
নিউজ পেপারের হেডলাইনে।

হাটে ঘাটে মাঠে সবার মুখের
আলোচনার ছিল এক মুখপাত্র।

ইউনাইটেড কিংডমে,
ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের
মেম্বারশিপ রেফারেন্ডাম হল,
রিমেইন এবং ব্রেক্সিট কে নিয়ে।
৩১শে জুন ২০১৬ জনগণ রায় দিল
গণভোটের মাধ্যমে ব্রেক্সিটের পক্ষে।

কত বাঘা বাঘা নেতা
ভাগলো শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে।
রাজ্য খাড়ালি ধরার
লোক পাইলো না খুঁজে।

ডেভিড ক্যামেরুন ও টেরিসা মে
হিমশিম খেলো ডিসিশন নিতে।
পরপর দু'জনেই অবসর নিল
সিদ্ধান্ত নিতে না পারে।

জার্মান রাজনীতিবিদ
উরসুলা ভন ডের লেইন
ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রপতি ও
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের
মধ্যে হয়েছিল ব্রেক্সিটের তুমুল
দর-কষাকষি ডিল ও নো-ডিল নিয়ে।

অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন
ধরিল হাল করিল ব্রেক্সিট

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ হল তার অবসান।

গণতন্ত্রের জয়

জনগণ আজ তাকিয়ে আছে
মার্কিন মাতব্বরের দিকে।
গদির লড়াই চলছে
আজ তাদের দেশে।

বিপুল ভোটে পাশ করেও
ক্ষমতা দিতে চায়নি ডোনাল্ড ট্রাম্প।
এলিগেশন অনিল বাইডেনের
বিরুদ্ধে ভোটের করাপশনের।

ট্রাম্পের লাগামছাড়া কথাবার্তা
রিপোর্টার বলেন আর রাজনীতিবিদ।
অসংযত আচরণ ও হেয় প্রতিপন্ন
করাটাই ছিল তার স্বভাব।
তার চলে যাওয়াতে রেহাই
পাইলো আজ পুরো দেশবাসী।

তোমার মৃদু হাসিতে
মুগ্ধ আজি বিশ্ববাসী।
এত লড়াইয়ের পর
হল তার অবসান।

সৎ সাহসের উপার্জন
গণতন্ত্রের লড়াই
জল্পনা-কল্পনা করে ও
নষ্ট করতে পারল না তোমায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর
আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত

পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য,
একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় জেলা ও
পাঁচটি স্বশাসিত অঞ্চল
নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয়
সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র।
আমেরিকা নামে তার পরিচিতি,
আজ নিলায় তার এই শাসন ভার।

বিশ্বজুড়ে মার্কিনদের রয়েছে কত
সামরিক সশস্ত্র অস্ত্রধারী ঘাঁটি।
আধুনিক অস্ত্রে সরঞ্জামে
সুসজ্জিত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে।
মহাকাশে রয়েছে তাদের
স্পেসশিপেরও অভিযান।

তোমার সাহসী সহযোদ্ধা হয়েছেন
এক অ্যাটর্নি জেনারেল ও সিনেটর।
বাবা প্রফেসার কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রো-আমেরিকান
মা সাইন্টিস্ট ইন্দো-আমেরিকান।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের
প্রথম নারী, অ-শ্বেতাঙ্গ হলেন
উপরাষ্ট্রপতি কমলা দেবী হ্যারিস।

ক্যাপিটেল হিলে সন্ত্রাসীদের হামলায়
সারা বিশ্ববাসী হয়েছিল অবাক।
কখনো আতঙ্কিত হয়নি রাষ্ট্র
এটা ছিল এক হিস্ট্রি ব্রেইক।
কত কৌশলে কন্ট্রোল করে
বিদায় দিলায় আতঙ্ক বাদীদের।

২০শে জানুয়ারি ২০২১ সালের

সকালবেলা ছিল অভিষেক অনুষ্ঠান।
উপস্থিত হল কত রাজনীতিবিদ
কত স্বজন আর গুণীজন।
শপথ নিলায় ক্যাপিটল হিলে
প্রমাণ করিলায় তুমি গণতন্ত্রের মানুষ।

সবকিছুর অন্ত করে পরিশেষে ঢোকিলায়
ওয়াশিংটন, ডি.সির, পেনসিলভানিয়া
এভিনিউয়ে অবস্থিত হোয়াইট হাউসে।
জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র
৪৬তম রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

নগ্নভূমি

পঞ্চভূমি আজ নগ্ন হয়ে যাচ্ছ তুমি,
ভূখণ্ডে আজ শুনছি শুধু তোমার চরণ ধ্বনি।
তোমার মাঠের খেলোয়াড়রা আজ করছে বাজিগরি,
নিজের কথা ভুলে গিয়ে করছে তাঁবেদারি।

হেমন্তের ছোঁয়া যেন লাগছে তোমার গায়ে,
গাছের পাতা ঝরে পড়ে উজাড় হয়ে যাচ্ছে চলে।
বসন্ত যে আসবে কবে খোদাতালাই জানে,
বর্ষার মত তুমি যে আজ ঘুরে বেড়াও দ্বারে দ্বারে।

শীতের মত ঘরে বসে করছ কি আজ তুমি,
গ্রীষ্ম কি আর আসবে না ফিরে-তোমার দ্বারে।
শরতের মত বিনষ্ট হতে দিয় নাকো তুমি,
সময় আছে ধৈর্য ধরো-ধীর মস্তিষ্কে কাজ করো।
চিন্তা করে দেখো তুমি-ধীমান গেছে কোথায় চলে।
হুরিরা যে আসবে না ঘুরে-মিলিয়ে দিবে ভুবনটাকে।

সর্বজন আজ ছত্রভঙ্গ-এক ইস্যুতে লন্ডভন্ড,
লোভ লালসা ছাড়ছে না কেউ-উপায় হবে কি।
দিনমজুরের কথা ছুড়ে-বিলাসিতার প্রভাব পড়ে,
দোয়া করি স্রষ্টার কাছে-মিলিয়ে দেখ হৃদয় মাঝে।

রঙ্গের খেলা

ধরণীতে চলেছে আজ রঙ্গের খেলা,
চতুরা আজ চতুর্দিকে করছে চোরের মেলা।
এতদিন দেখিলাম বেটার মাথায় টুপি আর
হাতে তসবির ছড়া।
এ দেখি আজ দল বদলের পালা,
পরনে ধুতি আর গলায় পড়েছে পুতির মালা।

সুযোগ পেলে বলে বেড়ায়,
বংশ বুনিয়াদ নাকি প্রাণ দিয়েছে রণাঙ্গনে।
ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে,
পাড়ি জমাতে চায় দূরপাল্লার দেশে।

পেশাদার মাস্তান হয়ে করছে সর্দারি,
এলাকাবাসী বুঝতে পারে না তার মতিগতি।
উপদেশ দিচ্ছি তোমায়-আজ শোনো মন দিয়ে,
অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে সমাজসেবক হইও না।

সমাজের নিতি গতি মেনে চল সোজা পথে,
নতুবা জনগণ কান টেনে
পরিয়ে দিবে গলায় জুতার মালা।

পঞ্চ বাসি

পঞ্চবাসি-লুটেরা তোমার লুটছে অংশ ও বাণী,
তুমি কি রাখছ না খবর একটুও খানি।
সবাই জাগো অন্যায় বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে থেকো,
যেখানে অন্যায় অবিচার সেখানে প্রতিবাদ করো।

ভয় করোনা তোরা বিপ্লবের ডাক ডাকো,
দুর্বল মানুষকে নেয়ায় বিচার দিতে থাকো।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে রুখে দাঁড়াও,
সর্বস্তরের জনগণ থাকবে তোমাদের সাথে।

কল্পনা করতে পারবে না একটুওখানি,
ক্লান্তি লগ্নে আছি তোমাদের সাথে।
প্রবাসে থেকেও মোরা ভুলতে পারি না,
মোদের সুমধুর প্রিয় জন্মভূমিকে।

রাক্ষসী নাইনটিন

চীনের হুবেই প্রদেশের
হান নদী ও ইয়াংসিকিয়াং নদী প্রান্তে
উহান শহরে জন্মে এক রাক্ষসী
ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বজুড়ে।
সে অদ্যকার খবরের হেডলাইনের
কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস।

রিপোর্টার, সাইন্টিস্ট, পলিটিশিয়ান ও ডাক্তার
সারাক্ষণ তাকে নিয়ে ব্যাকুল সবাই।
তারই প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায়
সমগ্র ভূখণ্ড আজ জর্জরিত।
সে হচ্ছে বর্তমানে পলিটিক্সের মেইন সাবজেক্ট
কেউ গবেষণায় আর কেউ করছে রাজনীতিতে
কেউ ফুড ব্যাংক আর কেউ করছে ভিন্ন চ্যারিটি।

মানুষ সকল আজ সর্বহারা
পৃথিবীটা এক বন্দিশালা।
কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন,
সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং, লকডাউন;
কোনটাই বা আসলে কী?

হাসপাতালে নেই কোন জায়গা
রোগী বরা করিডর আর স্টোররুমে।
চিকিৎসকের আজকার নেই কোন রেস্ট
তারাও আছে আতঙ্কের মাঝে।
কত চিকিৎসক দিয়েছে প্রাণ
সেবা দিতে গিয়ে এই মহামারিতে।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তের প্রাথমিক লক্ষণ
শ্বাসকষ্ট, জ্বর, সর্দি ও কাশির মত সমস্যা।
পাবলিক অতি আগ্রহী টেস্ট করলেই
পজিটিভ না নেগেটিভ রেজাল্টের অপেক্ষায়।
ছোঁয়া রোগ নাম তার স্প্রেড হয় খুবই দ্রুতগামী
এতে একে অন্যের সাথে করে না কেউ দেখা সাক্ষাত।
খুঁজে পাচ্ছে না তার সমাপন
প্রাণের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে
নিজ গৃহের বন্দি সবাই।
ডরে লোকজন যাচ্ছে না হাসপাতালে
না জানি মৃতদেহে বাইর হয়ে আসে।

প্রতিদিন কত মৃত্যুর খবর আসে
ফেইসবুকের পাতা ভরে
কত স্বজন হারিয়ে গেছে এই মহামারিতে।
লাশ আর লাশ চতুর্দিকে জায়গা নেই মর্গে
পার্কের মধ্যে মর্গ বানিয়ে- লাশ রেখেছে মেঝেতে।
কবরস্থান পারছে না সামাল দিতে
সমাধি করছে কত শব গণহারে।
কোভিড ১৯ এক বিচক্ষণ সঙ্গিন রাক্ষসী
গ্রাস করতেছে সারা বিশ্বের মানব জাতি।

রাজমহলের নথি

রাজমহলে চলছে আজ নথি নিয়ে খোঁজাখুঁজি
সিংহাসনের উত্তরসূরীদের নাহি কোন সমীহ।
আমি হয়তো নয় এই মহলের রাজা
রাজার চেয়ে জ্ঞানী স্বয়ং এক প্রজা।

প্রসাদে নেই মোর ভালো কোন প্রভাব
জ্ঞানীদের কাছে মোর আছে ভালো স্বভাব।
নিজে নয় কোন সহস্রা বাহিনীর অস্ত্রধারি
আমি হলাম শুধু এক কলম সৈনিক।

অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করা এটা নয় মোর বৃত্তি
কলম দিয়ে সমর করা হল মম কুলশীল।
আমার লেখনী ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও দ্রুতগামী
ভয়ভীতি ভুলে গিয়ে বিদ্রোহকে করি আলিঙ্গন।

সমাজনীতির পরিবর্তনে সর্বক্ষণ আছি উৎকণ্ঠিত
অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে করি সংগ্রাম।
কাগজের পাতা হল আমার রণাঙ্গন
মোর লিখা নাদ হলো অগ্নিগিরির লেলিহান শিখা।

তুমি মোর জন্মভূমি

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ-তুমি মোর জন্মভূমি।
তোমার উন্নয়ন নিয়ে চলছে-কত যে লুকোচুরি,
রাজ্যের উচ্চ মহলে-চলছে তোহে নিয়ে তামশা গিরি।
জালাল বাবার উচ্চধ্বনিতে শ্রীহট্ট থেকে সিলহট,
সিলহটের রাজ প্রসাদ ভেঙ্গে তুমি হয়েছ আজ সিলেট।

চলছি আজ ধরণীতে-তোমাতে পরিচয় দিয়ে,
তোমার গৌরবে আজ গর্বিত হয়ে-চির মম উন্নত শির।
তোমার উন্নয়ন-কেন পিছিয়ে আছে এতদিন ধরে,
আমরা কি বুঝিনা-রাজ দরবারের ষড়যন্ত্রে কারণে।

তোমার সোনার ছেলেরা-গোমরা হয়ে রয়েছে প্রসাদে,
তোমা হতে পরিচয় হচ্ছে-তাদের বিশ্বের কাছে।
বহির্বিশ্বের অর্থনীতির যখন মান্দা ভাব আসে,
তোমার দামাল ছেলেদের-পেরোনো বৈদেশিক মুদ্রায়
দেশের অর্থনীতিতে চাঙ্গা করে রাখে।

এতদিনের দাবি-সিলেটের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের,
সাথে রয়েছে ঢাকা-সিলেটের-ছয় লাইনের রাস্তা নিয়ে।
আমরা কি পারিনা-নিজেদের অর্থায়নে তা করিতে,
প্রয়োজন হলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নামবো মাঠে,
সবকিছু উজাড় করে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে।

পদ্মা সেতুর নির্মাণে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য জুটেছে আজ,
তাই তারই খুশিতে আজ-সারা বঙ্গ উন্মাদ।
উত্তরবঙ্গে যমুনার উপর দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু,
ভোলা আর বরিশালের মিলন ঘটছে
তেঁতুলিয়া নদের ১০ কিলোমিটার ফ্লাইওভার দিয়ে।

দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে তাদের ছায়ায়,
তোমার ভাগ্য কখন যে জুটিবে সৃষ্টিকর্তাই জানে।
গদির কথা চিন্তা না করে উন্নতি করো জন্মস্থানের
স্মরণীয় হয়ে থাকিবে তুমি ইতিহাসের পাতায়।

পদ-পদবী থাকবে ক্ষণস্থায়ী হয়ে রাজদরবারে,
উন্নয়নের কার্যকারিতা থাকবে চির মূল্যায়ন।
আজ যে কত নেতা আছেন মসনদের শীর্ষস্থানে,
উন্নয়নের ছোঁয়া একটুও লাগছে না যে তোমার গায়ে।
গদির চিন্তা না করে নিজের দাবি আদায় করো আগে,
জনগণের কাছে মহাপুরুষ হয়ে থাকবে চিরকাল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভরা তোমার মাধুর্য,
পাহাড় জঙ্গল সবুজে ঘেরা চা এর গালিচায়।
তুমি রয়েছো সুরমা, কুশিয়ারা আর সোনাই নদী তীরে,
কত নদ-নদী, খাল-বিল বহিছে জল তোমার ছাতি দিয়ে।

জলে-জলে ভরা হাকালুকি আর টাঙ্গুয়ার হাওর,
পাহাড় আর নদীর অপূর্ব সম্মিলনে-
জাফলং আর মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত।
পঞ্চখন্ডের জলঢুপি আনারস আর কমলা-লেবু,
সমগ্র ভূখণ্ডে রয়েছে তারই অঙ্কিত পরিচয়।
বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেভেন সিস্টার জুটি,
থাকবে মোদের আগামী প্রচেষ্টার
কর্মসূচির উচ্চ ধ্বনি।

ঝড়-বাদল

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভাসনোর মেলা,
অবিরত বৃষ্টিতে ভেজা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
আলোকপাতে জলে ভিজি শ্রাবনও রাতে,
অশ্রু সজল মুছে করি হাসাহাসি বৃষ্টিতে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ঘরের চালে গাছের ডালে,
ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি ঝরে পদ্মপুকুর জলে।
আজই এই বাদলও দিনে রিমঝিম বৃষ্টিতে,
গান করি মেঘ মল্লার করুণা ধারা দৃষ্টিতে।

মুষলধারে বৃষ্টি নামে জল জমেছে ঝিলে,
ভেলায় ভাসতে ভালো লাগে নব বৃষ্টির জলে।
দূর আকাশে রংধনুটা সাজি দিছে গগনটাকে,
মনের মাঝে ইচ্ছা করে ছুঁয়ে দেখার রংধনুকে।

মেঘের উপর মেঘ জমেছে আকাশ করে অন্ধকার,
রবি শশী লুকিয়ে আছে জগৎ করে আঁধার।
প্রণয় বকুল কোন ধাগাতে চোঁখে আঁকা জলছবি,
কবির হৃদয়ে উদিত স্মৃতি ছোট্ট কালের চিত্র ছবি।

মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে ঘূর্ণ বৃষ্টিপাতে,
উদাসী মন জেগে ওঠে রাগ-রাগিনীর সুরেতে।
কি সুরে বাজলো আলোর বেণুর বজ্র ধ্বনি
নয়ন জোরালো আলোক রশ্মির শব্দ শুনি।

মেঘলা দিনে ছায়াঘন অবকাশে ভানু,
নর ও নারী চলিল ছাতায় ঢাকা দিয়ে তনু।
পরিচলন বৃষ্টিপাতে নদে এলো বান,
মাঝি-মাল্লারা আপন সুরে ধরিল গান।

শৈল শিখায় জলীয়-আর্দ্র বাষ্পের কুপিত-বায়ু
পর্বত চূড়ায় শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতের স্নায়ু।
নামিলো পাহাড়ি ঢল উজাড় করে স্থল,
ভিন্নরূপে সাজিলো বৃষ্টিছায়ায় তৃণাঞ্চল।



জাহাঙ্গীর খান

জন্ম ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত মাথিউরা গ্রামে। শৈশব ও কিশোর কেটেছে নিজের গ্রামে। চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ছোট এবং মা বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান। জাহাঙ্গীর খানের দাদা জাফর আলি খান ও দাদি জহুরা বিবি। জাফর আলি খান জাহাজের চাকরির সূত্রে পরিবার নিয়ে কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসবাস করতেন, তিনি পরিচিত ছিলেন 'সারঙ্গ' নামে। সেই কারনে এলাকায় তার বাড়ির নাম 'জাফর মঞ্জিল' হলেও সবার কাছে 'সারঙ্গ বাড়ি' নামেই পরিচিত। জাহাঙ্গীর খানের বাবা নুরুল ইসলাম খান ও মা ফুলজান খানম। বাবা বিলেতে চাকরি করতেন, আর একমাত্র চাচা আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে জাহাঙ্গীর খানের পরিবার অংশগ্রহণ করায় পাকিস্তানি বাহিনী তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল, শুধু তাই নয় বিষয় সম্পত্তি সব নিলাম করে দেয়। যুদ্ধ কালীন অবস্থায় বাড়ি হারা হয়ে বাঙ্কারে বাঙ্কারে তাদের জীবন কেটেছে। ১৯৮৫ সালে শিক্ষাকালীন অবস্থায় জাহাঙ্গীর মা বাবার সাথে বিলেতে পাড়ি দেন। বিলাতে কয়েকবছর অধ্যয়ন করার পর শুরু হয় তার কর্মজীবন। কিছুদিন চাকরি করার পর নিজের ব্যবসায় প্রবেশ করেন এবং এর পাশাপাশি বিলাতের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল উন্নত মানের সনাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে, একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করা। বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলা, গান শোনা, কবিতা পড়া ও লেখালেখির প্রতি তার ছিল প্রবল আগ্রহ, কারন তাদের বাড়িতে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ ছিল। ১৯৮৮ সালে জাহাঙ্গীর খান লন্ডনের স্কুল শিক্ষিকা আফিয়া খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দুই মেয়ে জাকিয়া খান হাইস্কুলের শিক্ষিকা ও নাদিয়া খান ডাক্তার ও ছেলে সামিন খান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। তাদের নিয়ে জাহাঙ্গীর খান বিলেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

